

আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইসমাতুল আশিয়া, সাহাবায়ে কেরাম, তাকফীর, সুন্নাত ও ইমামাত
রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

১০. ৫. ৬. কিতাল বনাম কতল

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জিহাদ সাময়িক আবেগ এবং কিছু ভাল ও খারাপ মানুষের রক্তপাত ছাড়া কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। তারপরও আবেগী মানুষেরা ভাবেন, যে কোনোভাবে কিছু খারাপ মানুষ মেরে ফেললে বোধহয় দুনিয়া ভাল হয়ে যাবে। তারা দেখেন যে, রাষ্ট্র তাদের আবেগ অনুসারে জিহাদের অনুমতি দিচ্ছে না। অথবা রাষ্ট্র নিজেই ভাল মানুষদের দমনে লিপ্ত। এক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব আল্লাহর নির্দেশমত সহনশীলতা ও মন্দের মুকাবিলায় ভাল দিয়ে দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া এবং এভাবে জিহাদ করার মত একটি রাষ্ট্র অর্জন করা। আবেগী মানুষের এত ধৈর্য থাকে না। আল্লাহর নির্দেশমত ইবাদত পালনের চেয়ে নিজের মর্জিমত ফলাফল অর্জনে তার আগ্রহ বেশি। তিনি মনে করেন, এভাবে মানুষদেরকে আল্লাহর পথে এনে পছন্দমত সমাজ ও রাষ্ট্র অর্জন একটি অসম্ভব ব্যাপার। এজন্য তিনি বিভিন্ন অজুহাতে অনুমোদবিহীন জিহাদ বৈধ করতে চেষ্টা করেন। এরূপ একটি অজুহাত কতল বা হত্যার বিধান।

ইসলামে হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হত্যাকারীকে শাস্তি দেন নি।

কয়েকজন সাহাবী বর্ণিত মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, কারো জীবন, সম্পদ, পরিবার বা সম্ভ্রম আক্রান্ত হলে সে তা রক্ষার জন্য লড়াতে পারবে। এজন্য তাৎক্ষণিক কারো অনুমতির প্রয়োজন তো নেইই, উপরন্তু এক্ষেত্রে সে নিহত হলে শহীদ বলে গণ্য হবে এবং আক্রমণকারী ডাকাত, লুটেরা বা সন্ত্রাসী নিহত হলে বিচারে হত্যাকারী শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এ অর্থের এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন:

“একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর নিকট এসে বলে: হে আল্লাহর রাসূল, যদি কেউ আমার কাছে এসে আমার সম্পদ কেড়ে নিতে চায় তবে আপনার মত কী? তিনি বলেন: তুমি তাকে তোমার সম্পদ দিবে না। লোকটি বলে: যদি সে আমার সাথে লড়াই করে? তিনি বলেন: তাহলে তুমিও তার সাথে লড়াই করবে। লোকটি বলে: যদি সে আমাকে হত্যা করে? তিনি বলেন: তাহলে তুমি শহীদ হবে। লোকটি বলে: আর আমি যদি তাকে হত্যা করি? তিনি বলেন: সেক্ষেত্রে সে জাহান্নামী হবে।”[1]

এ অর্থের হাদীসগুলোর ভিত্তিতে ফকীহগণ নিশ্চিত করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে নিহত ডাকাত বা সন্ত্রাসীর রক্ত ‘বাতিল’; অর্থাৎ হত্যাকারী শাস্তি পাবে না।

অন্য একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন: “এক অন্ধ ব্যক্তির একটি দাসী স্ত্রী ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–কে গালিগালাজ করত। লোকটি তাকে নিষেধ করত, কিন্তু মহিলা কিছুতেই নিবৃত্ত হতো না। লোকটি তাকে ভয় দেখাত কিন্তু তাতে সে ভীত হতো না। এক রাতে মহিলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে গালিগালাজ ও ঘৃণ্য কথা বলতে শুরু করে। তখন অন্ধ লোকটি একটি ছুরি নিয়ে মহিলার পেটের উপর রাখে ও নিজের দেহ দিয়ে চেপে ধরে। এভাবে সে মহিলাকে হত্যা করে।... সকালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–কে খুনের ঘটনা বলা হলে তিনি মানুষদেরকে সমবেত করে বলেন: আমি আল্লাহর নামে দাবি করছি, যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে তার উপর যদি

আমার কোনো অধিকার থেকে থাকে তবে সে যেন উঠে দাঁড়ায়। তখন উক্ত অন্ধ ব্যক্তি উঠে মানুষের ভিতর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এগিয়ে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে বসে। সে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমিই তার হত্যাকারী। সে আপনাকে গালি দিত ও আপনার বিষয়ে ঘৃণ্য মন্তব্য করত। আমি তাকে নিষেধ করলেও নিবৃত্ত হতো না এবং ধমক দিলেও ভয় পেত না। সে আমার জন্য মুক্তের মত দুটি সন্তান দিচ্ছে। সে আমার সাথে সদয় ও প্রেমময় আচরণ করত। গতরাতে সে যখন আপনাকে গালি দিতে ও নোংরা কথা বলতে শুরু করে তখন আমি ছুরি নিয়ে তার পেটের উপর রাখি এবং নিজের দেহ দিয়ে চেপে ধরি। এভাবে আমি তাকে হত্যা করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَلَا أَشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ.

“তোমরা সাক্ষী থাক যে, এ মহিলার রক্ত বাতিল।”[2]

খারিজীগণ এ সকল হাদীস দিয়ে দাবি করেন যে, অন্ধ ব্যক্তি বা আক্রান্ত ব্যক্তি তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুমতি ছাড়াই কাফির বা পাপীকে হত্যা করল এবং কোনো শাস্তি পেল না। এতে প্রমাণ হলো যে, রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়াও জিহাদ করা যায়!!

আবেগের অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হলে তারা বুঝতেন যে, কতল বা হত্যার হাদীসের সাথে কিতাল বা জিহাদের বিধানের সামান্যতম সম্পর্ক নেই। এ হাদীসগুলো আরো প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় বিচার ও অনুমোদনের বাইরে কেউ কাউকে হত্যা করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে। তবে যদি বিচারের কাঠগড়ায় প্রমাণ হয় যে, সে আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করেছে, অথবা নিহত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে গালিগালাজ করছিল এবং তাকে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত হয় নি তবে সেক্ষেত্রে ইসলামী আইনে নিহত ব্যক্তির রক্ত বাতিল এবং হত্যাকারীর শাস্তি রহিত হবে।

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের নামে দল-গোষ্ঠী পরিচালিত জিহাদের ক্ষতির বিষয়ে “আল-ফিকহুল আবসাত”-এ ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য নিম্নরূপ:

قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَتَّبِعُهُ عَلَى ذَلِكَ نَاسٌ فَيَخْرُجُ عَلَى الْجَمَاعَةِ، هَلْ تَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: وَلِمَ؟ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهَذَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ. فَقَالَ: هُوَ كَذَلِكَ، لَكِنْ مَا يُفْسِدُونَ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِمَّا يُصْلِحُونَ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَاسْتِحْلَالِ الْمَحَارِمِ وَانْتِهَابِ الْأَمْوَالِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَفَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) قُلْتُ فَقَاتِلُوا الْفِتْنَةَ الْبَاغِيَةَ بِالسَّيْفِ؟ قَالَ نَعَمْ تَأْمُرُ وَتَنْهَى فَإِنْ قَبِلَ وَإِلَّا قَاتَلْتَهُ فَتَكُونُ مَعَ الْفِتْنَةِ الْعَادِلَةِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ جَائِرًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَضُرُّكُمْ جَوْرُ مَنْ جَارَ وَلَا عَدْلُ مَنْ عَدَلَ، لَكُمْ أَجْرُكُمْ وَعَلَيْهِ وَزُرُهُ) ... فَقَاتِلْ أَهْلَ الْبَغْيِ بِالْبَغْيِ لَا بِالْكَفْرِ وَكُنْ مَعَ الْفِتْنَةِ الْعَادِلَةِ وَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ، وَلَا تَكُنْ مَعَ أَهْلِ الْبَغْيِ ...

“আমি (আবু মুতী) বললাম, কোনো মানুষ ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে থাকেন। তখন কিছু মানুষ তার অনুগামী হয়। তখন তারা জামা‘আতের (রাষ্ট্র ও সমাজের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এদের বিষয়ে আপনি কি বলেন? আপনি কি এরূপ কর্মের স্বীকৃতি দেন? ইমাম আবু হানীফা বলেন: “না”। আমি বললাম, কেন? মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) তো ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এতো একটি জরুরী ফরয। তিনি বলেন: তা ঠিক; তবে তারা এভাবে ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়-ফাসাদ বেশি করে; কারণ তারা রক্তপাত করে, মানুষের ধন-সম্পদ ও সম্ভ্রম নষ্ট করার কঠিন হারামে নিপতিত হয়, ধনসম্পদ লুটপাট করে। মহান আল্লাহ বলেছেন: “মু‘মিনদের দু‘দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করবে; আর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে যারা বিদ্রোহ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে...”।” আমি বললাম: তাহলে কি আমি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করব? তিনি বলেন: হ্যাঁ। তুমি আদেশ ও নিষেধ করবে। যদি গ্রহণ করে তবে ভাল। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাহলে তুমি ন্যায়পন্থী দলের (রাষ্ট্র ও সমাজের) সাথে থাকবে, যদিও রাষ্ট্রপ্রধান জালিম হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: জালিমের জুলম ও ন্যায়পরায়ণের ইনসাফ কোনোটিই তোমাদের ক্ষতি করবে না। তোমরা তোমাদের পুরস্কার লাভ করবে এবং তারা তাদের শাস্তি পাবে।... কাজেই তুমি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বিদ্রোহের কারণে, কাফির হওয়ার কারণে নয়। আর ন্যায়পন্থী জনগোষ্ঠী (মূল সমাজ) ও জালিম শাসকের সাথে থাকবে, কিন্তু বিদ্রোহীদের সাথে থাকবে না।”[3]

এখানে ইমাম আবু হানীফা রাষ্ট্রপ্রধান জালিম বা পাপী হলেও রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে অনিয়ন্ত্রিত জিহাদের ক্ষতির দিকটি তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি সাহাবীগণের ধারা অনুসরণ করেছেন। সাহাবীগণও এরূপ অনিয়ন্ত্রিত জিহাদের ক্ষতিকর দিক আলোচনা করেছেন।

৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ মক্কা অবরোধ করে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-এর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালাতে থাকেন। তৎকালীন যুবকদের অনেকেই ভাবতে থাকে যে, হাজ্জাজের বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মুসলিম বিশ্ব চিরতরে কাফির-ফাসিক ও জালিমদের পদানত হয়ে যাবে। অনেক যুবকই প্রবল আবেগে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)-এর পক্ষে জিহাদে যোগ দিতে থাকেন। এ সময়ে দু ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর নিকট এসে বলেন:

إِنَّ النَّاسَ ضَيُّعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي،
وفي رواية: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحْجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرَكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغِبَ اللَّهُ فِيهِ
قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ
وَحَجِّ الْبَيْتِ وفي لفظ: فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً) فَقَالَ قَاتِلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً وَكَانَ الدِّينُ
لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ

“মানুষেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর সাহাবী, আপনাকে বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে কিসে? তিনি বলেন, “আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন, তাই আমি যুদ্ধে অংশ নিচ্ছি না।” অন্য বর্ণনায় তারা বলেন: “কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ দিয়েছেন?” তখন তিনি বলেন, “ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের সিয়াম, যাকাত প্রদান ও বাইতুল্লাহর হজ্জ।”[4] অন্য হাদীসে: “তারা বলে, আল্লাহ কি বলেন নি, ‘এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়’? তখন তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করবে যেন ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হয়।”[5]

এক খারিজী নেতা ইবন উমার (রা)-কে জিহাদ ছেড়ে হজ্জ-উমরা নিয়ে মেতে থাকার বিষয়ে প্রশ্ন করে। তিনি তাকে আরকানুল ইসলামের কথা বললে সে বলে:

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ) (قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) قَالَ فَعَلْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ حَتَّىٰ كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ

“হে আবু আব্দুর রাহমান, আল্লাহ তাঁর কিতাবে কী বলেছেন তা কি আপনি শুনছেন না? তিনি বলেছেন:

‘মুনিগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।’ (তিনি আরো বলেছেন): ‘এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়’[6]। তখন ইবনু উমার বলেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) – এর যুগে তা করেছিলাম। ইসলাম দুর্বল ও স্বল্প ছিল, ফলে মুসলিম ব্যক্তি তার দীনের কারণে ফিতনাগ্রস্থ হতেন। কাফিররা তাকে হত্যা করত অথবা তার উপর অত্যাচার করত। যখন ইসলাম বিস্তৃত হয়ে গেল তখন তো আর ফিতনা থাকল না।”[7]

জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী (রা) কয়েকজন খারিজী মুজাহিদকে ডেকে একত্রিত করে তাদেরকে ঈমানের দাবিদারকে হত্যা করার বিষয়ে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাফিরদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধের মাঠে একজন কাফির সৈনিক মুসলিম বাহিনীর অনেক সৈনিককে হত্যা করে। এক পর্যায়ে উসামা ইবনু যাইদ (রা) উক্ত কাফির সৈনিককে আক্রমণ করেন। তিনি যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন তখন সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে। উসামা সে অবস্থাতেই তাকে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উসামাকে বলেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পরেও তুমি তাকে কেন হত্যা করলে? তিনি বলেন, লোকটি অনেক মুসলিমকে হত্যা করে। আমি যখন তরবারী উঠালাম সে তরবারীর ভয়ে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তুমি তার হৃদয় চিরে দেখে নিলে না কেন, সে ভয়ে বলেছে না স্বেচ্ছায় বলেছে! ... তিনি বারবারই বলতে লাগলেন, কেয়ামতের দিন যখন এ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উপস্থিত হবে তখন তুমি কী করবে?[8]

সাহাবীগণের এ সকল বক্তব্যের মধ্যে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

- (১) আরকানে ইসলাম ও এ জাতীয় ইবাদতই মুমিনের মূল দায়িত্ব। এগুলো ‘উদ্দিষ্ট’ ইবাদত (ইবাদতে মাকসূদা)। এগুলো পালন করাই মুমিন জীবনের উদ্দেশ্য। এগুলি পালনের গুরুত্ব কখনোই কমে না বা থামে না। পক্ষান্তরে ‘জিহাদ’ উদ্দিষ্ট ইবাদত (ইবাদতে মাকসূদা) নয়; বরং উদ্দিষ্ট ইবাদত পালনের অধিকার রক্ষার জন্যই জিহাদ। এ অধিকার বিদ্যমান থাকলে জিহাদের আবশ্যিকতা থাকে না।
- (২) জিহাদ করা আল্লাহর নির্দেশ এবং মানুষ হত্যা করা আল্লাহর নিষেধ। নিষেধের পাল্লাকে ভারী রাখতে হবে এবং হারামে নিপতিত হওয়ার ভয় থাকলে জিহাদ পরিত্যাগ করতে হবে।
- (৩) কাফির রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র, নাগরিক ও দীনী দাওয়াতের স্বাধীনতা ও বিজয় সংরক্ষণই মূলত জিহাদ। মুসলিম ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা হত্যা জিহাদ নয়। যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে বা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ মুখে স্বীকার করে তাকে জিহাদের নামে হত্যা করা পারলৌকিক ধ্বংসের অন্যতম কারণ।
- (৪) ফিতনা দূরীকরণ জিহাদের উদ্দেশ্য। তবে ফিতনা দূরীকরণ বলতে সমাজের সকল অন্যায়, অনাচার, কুফর, শিরক ইত্যাদি দূর করা নয়, বরং মুমিনকে জোরপূর্বক কুফরে লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি দূরীকরণ বা দীনপালন ও দীনী দাওয়াতের স্বাধীনতা রক্ষা করা। এরূপ পরিস্থিতি ছাড়া জিহাদ মূলত ফিতনা দূর করে না, বরং ফিতনা সৃষ্টি করে। কারণ সকল সমাজেই অন্যায় ও জুলুম থাকে এবং সর্বদা ধর্মহীন ও পাপাচারীর সংখ্যা ও শক্তি ধার্মিক ও সৎ মানুষদের চেয়ে বহুগুণ বেশি হয়। যদি ধার্মিক মানুষেরা শান্তিপূর্ণ ও ধৈর্যপূর্ণ দাওয়াত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ না করে জিহাদ বা সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করেন তবে তা বহু মহাপাপ, হত্যা ও ফিতনার দরজা উন্মুক্ত করে। ইমাম মাহদী প্রসঙ্গে আমরা দেখব যে, দ্রুত অন্যায় দূর করে ‘আদর্শ সমাজ’ প্রতিষ্ঠার আবেগী চেষ্টা রক্তপাত ও বিভ্রান্তি ছাড়া কোনো ফল দেয় নি।

ফুটনোট

- [1] মুসলিম, আস-সহীহ ১/১২৪, নং ১৪০।
- [2] আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/১২৭ (কিতাবুল হুদূদ, হুকুম ফীমান সাববা..)
- [3] ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৪৫, ৫২।
- [4] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০।
- [5] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০।
- [6] সূরা (২) বাকারা, ১৯৩ আয়াত।

[7] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০।

[8] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯৬-৯৭; নাবাবী, শারহু সাহীহি মুসলিম ২/১০১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১২/১৯৬, ২০১।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7221>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন